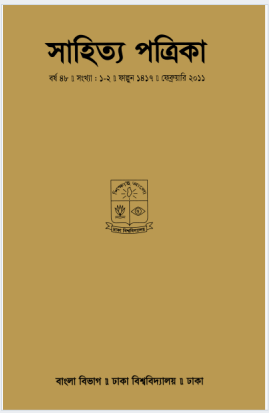

Vol. 48 | No. 1-2 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সূর্য-দীঘল বাড়ী : অপরাজেয় জীবনালেখ্য

Volume	48
Issue	1-2
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Hosne Ara
Published online	February 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i1-2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i1-2.4
Pages	৫৩-৭২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সূর্য-দীঘল বাড়ী : অপরাজেয় জীবনালেখ্য

Check for updates

হোসনে আরা*

'যে দুঃসময়ে সময়ের গ্রন্থি ভেঙে যায়, তখনই ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস লেখার সুসময়'।[১]— দেবেশ রায়ের এ মন্তব্যে বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়; আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে, সমাজ বা মানবজীবনের দুঃসময় ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস লেখার সুসময় কিন্তু প্রকৃত অর্থে মানুষের দুঃখে সুখী নন ঔপন্যাসিকেরা বরং ভয়ংকর দুঃসময়ে মানবতার স্ফুরণ বা জীবন-সংগ্রাম অথবা দুঃসময়কে কাটিয়ে নতুন করে বাঁচার স্পৃহায় ভেঙে পড়া মানুষের আবারও দৃঢ় হয়ে ওঠা — মানবজীবনের এই ইতিবাচকতাকে তারা তাদের উপন্যাসের ফ্রেমে ধারণ করবার চেষ্টা করেন। পরাজয় নয়, ধ্বংস নয়, ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যে সৃষ্টির সূচনা — তাই তাদের অন্বিষ্ট।

কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাক তাঁর কালজয়ী উপন্যাস *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫) রচনা করেছেন ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী জীবনসংগ্রামের কাহিনী নিয়ে। উপন্যাসের মূলকাঠামোয় দুর্ভিক্ষের আলাপন অল্প হলেও গৌণ নয়; বর্ণিত জীবনের পরতে পরতে দুর্ভিক্ষের স্মৃতির বিভীষিকা স্পষ্ট। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে অপরাজেয় জীবনের অনুপম আলেখ্য নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের আলোচনায় ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, যা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত, তার আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক।

১৯৪৩ সালে বাংলার জনসমাজ কেঁপে উঠেছিল মানুষের তৈরি এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আঘাতে। সে আঘাতের চিহ্ন বাংলার জনমানসে স্থায়ী হয়েছিল বেশ কয়েক দশক ধরে। জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষা করে ইংরেজ সরকার যখন ক্ষেতের ধান আর নৌকা দখল করে নিজেদের যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাচ্ছিল; চাল রপ্তানি করছিল ; যখন জোতদার আর মজুতদারেরা সীমাহীন লাভের মোহে বিপুল পরিমাণ ধান মজুত করে চলেছিল — সে-সময় দেশে সৃষ্টি হয়েছিল এক কৃত্রিম খাদ্য সংকট। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে যেখানে ধান বিক্রি হয়েছিল চৌদ্দ আনা মণ দরে, সেখানে মাত্র তিন মাসের মধ্যে সেই চালের দর তিন টাকা মণ থেকে ছাপ্পান্ন টাকায় পৌঁছেছিল । তারপরই দেখা দেয় শতাব্দীর করুণতম দৃশ্য। লক্ষ লক্ষ কঙ্কালসার মানুষ একটু খাবারের খোঁজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কিংবা শহরের দিকে যাত্রা করেছে — পথেই ঢলে পড়েছে ক্ষিধেয় এবং প্রাণবায়ু নিঃশেষ হবার আগেই তাদের দেহ ছিঁড়ে খেয়েছে শেয়াল, শকুনের দল। কোন কোন মহলের হিসেব মতে ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে মৃত্যুর হার দৈনিক পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়েছিল।[২] সেই নিদারুণ সময়ের বর্ণনা পাওয়া যায় ইতিহাসে, পাওয়া যায় বাংলার সংবেদনশীল লেখকদের লেখায়, চিত্রশিল্পীদের চিত্রকর্মে, পাওয়া যায় সাহিত্যে।

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের সূচনা হলেও এর সময়সীমা দেশবিভাগ ও তার অব্যবহিত পরবর্তীকাল। দুর্ভিক্ষের নিদারুণ তাড়নায় যারা

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নিরুপায় হয়ে শহরে গিয়েছিল দু'মুঠো ভাতের আশায়, তারা আবার বাঁচার প্রেরণায় ফিরে আসে গ্রামে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জয়গুনও তাদেরই একজন। দুর্ভিক্ষের বছরে বিনাদোষে তালাক-প্রাপ্তা জয়গুন দুই কন্যা ও এক পুত্র নিয়ে স্বামী-গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে নিশ্চেষ্ট ছিল কিছুকাল; কিন্তু খেতে না পেয়ে যখন তার কোলের শিশুটি মারা যায়, কাফনের অভাবে নিজের বিয়ের শাড়ির অর্ধেকটা জড়িয়ে তাকে কবরে নামিয়ে অবশিষ্ট দুই সন্তানকে বাঁচানোর তাগিদে বাধ্য হয় সে গ্রাম থেকে শহরে যেতে। শহরের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের জলুস তাদের চোখ ধাঁধায় কিন্তু পেট ভরায় না। লঙ্গরখানায় দুমুঠো খাবারের আশায় দিন কাটে, নর্দমায় রাস্তার কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খাবার খেয়ে কোনমতে প্রাণধারণ করে যারা বেঁচে থাকে — একসময় তারা ফিরে আসে আবার গ্রামে| ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

> যারা ফিরে আসে তারা বুক ভরা আশা নিয়ে ফিরে আসে বাঁচবার। অতীতের কান্না চেপে, চোখের জল মুছে তারা আসে, কিন্তু মানুষের চেহারা নিয়ে নয়। তাদের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। ধনুকের মত বাঁকা দেহ—শুষ্ক ও বিবর্ণ। তবুও তারা ভাঙা মেরুদণ্ড দিয়ে সমাজ ও সভ্যতার মেরুদণ্ড সোজা করে ধরবার চেষ্টা করে। ধুক্‌ধুকে প্রাণ নিয়ে দেশের মাটিতে প্রাণ সঞ্চার করে, শূন্য উদরে কাজ করে সকলের উদরের অন্ন যোগায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে হুঁচোট খাওয়া দেশ আবার টলতে টলতে দাঁড়ায় লাঠিতে ভর দিয়ে।[৩]

পঞ্চাশের মন্বন্তর কাটিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন এক দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় ভীত-সন্ত্রস্তজীবন-যাপন করে তারা। চালের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে উদয় হয় 'দৈইক্যো মিয়ারা, আধা মানুষ মইর‍্যা যাইব এইবার। পঞ্চাশ সনের চাইয়া বড় আহাল অইবো এইবার।'[৪] খুশীর বার্তা বয়ে নিয়ে আসে যে ঈদের চাঁদ — সেই চাঁদের আকৃতির মাঝেও নিরন্ন মানুষ ভবিষ্যৎ ভয়াবহতার ইঙ্গিত খোঁজে —"হেই আকালের বছর পঞ্চাশ সনে দক্ষিণ মুহি কাইত অইয়া ঈদের চান উঠছিল। দক্ষিণ মুহি কাইত অইয়া উঠলে আকাল অইবই।"[৫] বস্তুত প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সাধারণ মানুষ তাদের জীবনকে জড়িয়ে নিতান্ত অসহায় জীবন-যাপন করে আসছে আবহমান কাল ধরে। আসন্ন উৎসব উদযাপনেও তাই তাদের ভয়, তাই প্রকৃতির ইঙ্গিতে তারা ভবিতব্যের দায় এড়াতে চায়।

উপন্যাসের শেষাংশেও নবগঠিত দেশের অভ্যুদয়ের বছরে নতুন করে দেখা মেলে 'দৈত্যরূপী' দুর্ভিক্ষের —

> নাবিক সিন্দাবাদের ঘাড়ের ওপর এক দৈত্য চেপে বসেছিল। বাঙলা তেরোশ পঞ্চাশ সালের ঘাড়েও তেমনি চেপে বসেছিল দুর্ভিক্ষ। হাত-পা শেকলে বাঁধা পরাধীন সে বুভুক্ষু তেরোশ পঞ্চাশের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে তার পরের আরো চারটি উত্তরাধিকারীর। কিন্তু দুর্ভিক্ষ আর ঘাড় থেকে নামে নি। ঘাড় বদল করেই চলেছে একভাবে। হাত-পায়ের বন্ধনমুক্ত স্বাধীন তেরোশ' পঞ্চান্নে এসেও সে আকাল-দৈত্য তার নির্মম খেলা খেলছে। তাকে আর ঘাড় থেকে নামান যায় না।
>
> দেশে চালের দর কুড়ি টাকার নিচে নামে না বছরের কোন সময়ই। ফাল্গুন মাস থেকে সে দর আরো চড়ে যায়। চড়ে যায় লাফিয়ে লাফিয়ে। চল্লিশ টাকায় গিয়ে ঠেকে। আউশ ধান ওঠার

আগে এই দর আর নামে না। ফলে যারা টেনেটুনে দু'বেলা খেত, তারা এক বেলার চালে দু'বেলা চালায়। ফেনটাও বাদ যায় না। ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে দুধ-ভাতের মত করে খায়। যারা দু'বেলা আধ-পেটা খেয়ে থাকত, এ সময়ে তারা শাক-পাতার সাথে অল্প চাল দিয়ে জাউ রেঁধে খায়। ক্ষুধিতের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যায়। পেটের জ্বালায় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অনেকে। আশা Ñদশ দুয়ারে মেগে এক দুয়ারে বসে খাবে। কিন্তু দশের দশা শোচনীয়। সমস্ত দেশ দিশেহারা। দুর্ভিক্ষে কে দেয় ভিক্ষে?

এ পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ শুধু কি ভাতের? কাপড়েরও। শত কপাল কুটলেও সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দ্বিগুণ দিয়েও একখানা কাপড় পাওয়া যায় না। অনেকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দেয় একই কাপড়ে।[৬]

বস্তুত, যুগে যুগে কৃষি-নির্ভর এই বাংলার সাধারণ মানুষ যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কিংবা মানব-সৃষ্ট দুর্যোগে সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত — তাদের জীবন-ধারণ যে চিরকালই সংগ্রামমুখর — বাংলা সাহিত্য সবকালেই সেইসব প্রান্তিক মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা ধারণ করেছে; কখনও ধর্মসংগীতের আড়ালে, কখনও বা মঙ্গলকাব্যের আধারে। রূপকথা বা লোকসাহিত্যে আরও তীব্রভাবে আমরা সে-কথা পাই। গ্রামীণ রূপকথায় নিরন্ন মানুষ শক্তিশালী দেবতা বা দানবকে খুশি করে লাভ করে একটি হাঁড়ি — যা সর্বদাই প্রার্থিত খাদ্যবস্তুর অঢেল সরবরাহ নিশ্চিত করে। সমকালীন সাহিত্যের এক বিরাট অংশ জুড়ে এই দুর্ভিক্ষের ছবি আছে। বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত', শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক', শওকত ওসমানের 'জননী' কিংবা শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' প্রভৃতি উপন্যাসে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের নিদারুণ দুর্দশার চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্প 'নয়নচারা', কিংবা বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'নবান্ন'-এ দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী কাহিনী শিল্পিত হয়েছে।

দেশে দুর্যোগ হয়ে দেখা দেয় যে মন্বন্তর, ইতিহাসের পাতায় কেবল সেগুলোই লিপিবদ্ধ থাকে, কিন্তু সন-তারিখ ধরে নয় প্রতিনিয়ত গ্রামীণ অভাবী মানুষ যে ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলছে, কোন রকমে উদরের জ্বালা মেটাতে যারা প্রাণপণ সংগ্রাম করছে — তাদের কথা ইতিহাসে নয়, উঠে আসে সাহিত্যে। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে অনাহারক্লিষ্ট সংগ্রামী মানুষের জীবন জয়গুনের জীবন-সংগ্রামের মাধ্যমে চমৎকারভাবে শিল্পিত হয়েছে।

দুর্ভিক্ষের পর গ্রামে ফিরে জয়গুন জনবসতি-শূন্য সূর্য-দীঘল বাড়ীতে নতুন করেই পুরোনো ক্ষুধাতুর জীবনের শুরু করে। বাড়ি বাড়ি ঘর লেপে, ধান ভেনে, চিড়া কোটে এবং উত্তর থেকে সস্তায় চাল কিনে এনে তা বিক্রি করে। তার ছেলে হাসু সারাদিন মোট বয়ে উপার্জন করে দশ বারো আনা। তা দিয়ে তিনজনের তিনবেলা পেটভরে খাবার জোটে না। পান্তাভাত, পোড়ামরিচ, শাক-পাতা ও বড়শিতে ধরা ছোট মাছ — এই তাদের নিত্যদিনের আহার্য। রান্না হয় দিনে একবার সন্ধ্যার পর, কাজ থেকে ফিরে। রাতে অর্ধেক খেয়ে সকালে পান্তাভাত — তাও পেট পুরে নয় — তাই খেয়ে কাটাতে হয় সারাটা দিন। ফেনটাও ভাগাভাগি করে খেয়ে নেয় তারা; পান্তাভাতের লবণ যোগানো কষ্টকর তাদের জন্য। ঈদ বা বিয়ের মতো উৎসবের দিনেও তাদের আহার্য অতি সামান্যই। ঈদের দিন

সামান্য গুড় দিয়ে পানসে করে মিষ্টান্ন, বিয়েতে দুটো শোল মাছ ও দুটো লাউ দিয়ে তরকারি, ডাল আর দুধ — এই সামান্য খাবার উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। খাবারের রকমারিত্ব তাদের কাছে গৌণ — কোনোরকমে পেট ভরানোই মুখ্য। কেবল জয়গুন নয়, তার শ্রেণির সকল সাধারণ মানুষই উদর পূর্তি নিয়ে বিব্রত, মায়মুনার বিয়েতে জনৈক বৃদ্ধ গ্রামবাসীর কথায় তার প্রমাণ মেলে —

> মাইন্ষের প্যাট ছোড অইয়া যাউক Ñ খোদার কাছে আরজ করি। বেবাকের প্যাডে মাজায় লাইগ্যা এক অউক। এক ছডাকের বেশি যেন খাইতে না অয়।...মাইন্ষের প্যাটটা না থাকলে আমি খুশি অইতাম। প্যাডের জ্বালাই বড় জ্বালা মাইন্ষের।[৭]

গ্রামীণ সাধারণ মানুষের কাছে অন্ন সম্পর্কিত ভাবনাই প্রধান। স্বাধীনতার মাঝে তারা কোন মহৎ আবেগ নয় — 'চাল সস্তা হবে', 'কারো কোন কষ্ট থাকবে না' এই আশাবাদ খুঁজে পায়। ভাত-কাপড় সুলভ হলে সহজতর দিন-যাপনের আশায় তারা উজ্জীবিত হয়; নতুন দেশের পতাকা উড়িয়ে জয়ধ্বনি দেয়। কোন রাজনৈতিক দর্শন নয়,জীবনের মৌল চাহিদা অন্ন-বস্ত্রের সুলভ্যের আকাঙ্ক্ষায় তারা স্বাধীনতার তাৎপর্য খুঁজে পায়। স্বাধীনতার চাইতে ক্ষুধার যন্ত্রণার গুরুত্ব বেশি তাদের জীবনে। তাই স্বাধীনতার ফলভোগী যখন হয় না এসব নিরন্ন মানুষ তখন সকলই ফাঁকি বলে প্রতিভাত হয় তাদের নিকট —

> স্বাধীন যে অইল হের কোন নমুনাই যে পাইলাম না আইজও। কত আশা-ভস্সা আছিল। স্বাদীন অইলে ভাত কাপড় সাইয্য অইব। খাজনা মকুব অইব। কিন্তু কই? বেবাক ফাঁটকি, বেবাক ফাঁট্কি।[৮]

শ্রেণি-বিভক্ত বাংলার সমাজে সাতচল্লিশের স্বাধীনতা যে প্রকৃতঅর্থে কতটা অসার — ঔপন্যাসিক তা চৌকশ ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। এই স্বাধীনতা শ্রমজীবী মানুষের স্বাধীনতা নয়, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সুবিধাজনক পদে অধিষ্ঠিত শ্রেণি আর নতুন রাষ্ট্রে বেনিয়া ধনিক শ্রেণির সুবিধালাভের নব উপায় মাত্র — সাতচল্লিশ এবং তৎ-পরবর্তী বামপন্থী রাজনীতিকরা তা স্পষ্ট করেই রাজনৈতিক তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে জোরালোভাবে প্রচার করেছেন। কোন বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনলগ্ন হয়ে নয়, কেবল সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে ঔপন্যাসিক ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সঙ্গে গণমানুষের ক্ষুধামুক্তির আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসে 'স্বাধীনতা' বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে নয়, সাধারণ মানুষের আশা ও আশাভঙ্গের সূত্র ধরেই এসেছে; তেমনি দেশবিভাগও বৃহত্তর মানবিক বিপর্যয় বা রাজনৈতিক দর্শনের আলেখ্য হিসেবে আসে নি। বস্তুত, নির্দিষ্ট কাল পরিসরে উপন্যাসের কাহিনী বিস্তৃত বলে অবধারিতভাবেই কালানুক্রমে 'দেশবিভাগ' ও 'স্বাধীনতা'-এর প্রসঙ্গ এসেছে। লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুটি বিষয় বিশ্লেষণ করেন নি, যেমনটা করেছেন দুর্ভিক্ষ-প্রসঙ্গটি। এ দুটি প্রসঙ্গ উপন্যাসের চরিত্র — হাসু, জয়গুন এবং সমগোত্রীয় অন্যান্য নিরন্ন মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে রূপায়িত হয়েছে। তবে রমেশ ডাক্তারের প্রসঙ্গে এসে লেখক দেশবিভাগের বেদনা নিজস্ব মননে সংশ্লিষ্ট করে কিছুটা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। দেশবিভাগের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এবং

তৎ-সম্পর্কিত ভীতি সাধারণ মানুষ তথা হাসুর দৃষ্টিকোণে উপন্যাসে উঠে এসেছে এভাবে—

> ১৫ই আগস্ট শুক্রবার, ১৯৪৭ সাল। ...
> রাস্তায় উঠেই সে চমকে ওঠে। চারদিক থেকে চিৎকারের ধ্বনি শোনা যায়। হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি শুরু হল না ত! ...
> গতবছর এমন দিনে মারামরি বেঁধেছিল। পনেরো দিন সে ঘরের বার হতে পারেনি। তিনদিন না খেয়ে কাটাতে হয়েছে।[৯]

সামাজিক-রাজনৈতিক যেকোনো অনুষঙ্গে পুনঃ পুনঃ 'না খেয়ে কাটানোর' প্রসঙ্গ এসেছে আলোচ্য উপন্যাসে। খেতে পাওয়া বা না-পাওয়া যাদের জীবনের একমাত্র ভাবনা ,তাদের দৃষ্টিকোণে যেকোনো বিষয়ে যে অন্নের প্রসঙ্গ আসবে তা-ই স্বাভাবিক। যদিও উপন্যাসের আরেকাংশে ঔপন্যাসিক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে দেশবিভাগজনিত দেশত্যাগের মর্মান্তিক কাহিনী বলবার চেষ্টা করেছেন—

> স্বাধীনতা অর্জনের পরে বাস্তুত্যাগের হিড়িক পড়েছে দেশে। ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের চোখে লেগেছে আলোর ধাঁধা। ডাক্তারের স্ত্রীর চোখেও তাই লেগেছে।.... কিন্তু আদম তার সংকল্পে অটল। সে জানে, নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার অর্থ স্বর্গ-ভ্রষ্ট হওয়া। ঈভ তাই নিষিদ্ধ ফলের সাজি নিয়ে ব্যর্থ হয় বারবার।[১০]

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সুযোগে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ঘটিয়ে একশ্রেণির সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী দেশত্যাগে বাধ্য করেছে বহুমানুষকে। সাতচল্লিশ-পরবর্তী দেশত্যাগ ও উদ্বাস্তু-সমস্যা ভারতীয় উপমহাদেশের এক বিকট সমস্যা। দেশত্যাগের এবং দাঙ্গার কুফল মানুষ ঠিকই উপলব্ধি করেছে কিন্তু সময় ও প্রতিবেশের বিরূপতার বলি হতে হয়েছে বহুলোককে। দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও ঋজু মানসিকতা নিয়ে যারা তখনও বাস্তুভিটা আঁকড়ে ধরে ছিল, কোন ভয়-ভীতি বা হুজুগে মত্ত না হয়ে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে, রমেশ ডাক্তার তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে তাঁর উপলব্ধি অত্যন্ত মূল্যবান —

> কতগুলো পশুর প্ররোচনায় যা হয়েছিল, তা আর হবে না দেখে নিও। ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না — সবাই বুঝতে পেরেছে। ভাইয়ের বুকের রক্তে যে করুণ অভিজ্ঞতা হল, হিন্দু-মুসলমানের মন থেকে তা সহজে মুছে যাবে না। আর যদি একান্ত মুছেই যায়, তবে বুঝব, তার পেছনে কাজ করেছে স্বার্থান্ধ হিংস্রতা।[১১]

লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে এ উক্তিতে। মানুষের প্রতি বিশ্বাস লেখকের ব্যক্তিজীবনে খুব দৃঢ়। অত্যন্ত স্বল্প-পরিসরে লেখক দেশবিভাগ ও দেশত্যাগী মানুষের দুর্দশা এবং এর পেছনে স্বার্থান্বেষী 'হিংস্রতা'র উল্লেখ করেছেন কিন্তু বিস্তৃত অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন নি। লেখকের এই পরিমিতিবোধ প্রশংসার দাবি রাখে নিঃসন্দেহে। স্বাধীনতা, দেশবিভাগ, দেশত্যাগ, উদ্বাস্তু–সমস্যা প্রভৃতি বিষয় বিস্তৃতভাবে উপন্যাসে এলে হয়ত উপন্যাসের মূলসুরের বিনাশ ঘটত, হয়ত ঔপন্যাসিকের বক্তব্য-স্রোতও কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য খুঁজে পেত না। তাই সেসব ঘটনা বিস্তৃত করেন নি লেখক — কাহিনীর সঙ্গে, চরিত্রের

জীবন ও মানসে যতটুকু প্রভাব ফেলেছে — ততটুকুরই সীমিত উপস্থাপনে কাহিনীর গতিকে মসৃণ ও সমৃদ্ধ করেছেন।

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসে একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের সমাজ এবং সেই সঙ্গে আবহমান কালের সমাজ কাঠামো, সংস্কার, বৈষম্য, শোষণকে উপস্থাপন করা হয়েছে। দেশবিভাগের বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে তাই চিরকালীন গ্রামবাংলাকে খুঁজে পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। অসহায় মানুষের জীবন-সংগ্রামে দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য বা শোষণের চিত্র ঔপন্যাসিক চমৎকারভাবে এঁকেছেন। শ্রেণি-বিভক্ত সমাজে চিরকাল শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। জয়গুনের দুর্দশার পাশাপাশি অপরাপর শোষিত মানুষের চিত্র পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। কেবল গদু-প্রধান নয়, ফুড কমিটির সেক্রেটারি খুরশীদ মোল্লা, গ্রামের মোড়ল কাজী খলিল বক্‌শ প্রভৃতি ধনিক শ্রেণির কতিপয় কালোবাজারির মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে । ঈদ উপলক্ষে সরকার-প্রদত্ত চিনির এক কণাও ভাগে পায় না সাধারণ মানুষেরা। রেশনের সেই চিনি দুই টাকা সেরে তাদের কিনতে হয় ফুড কমিটির সেক্রেটারি খুরশীদ মোল্লার ভাই লতিফ মোল্লার দোকান থেকে। প্রতিবাদ করার মতো কোন জোর তাদের নেই কেননা সমাজের যারা মাথা — তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাগ পেয়ে এই কালোবাজারিকে সমর্থন জানায়। খুরশীদ মোল্লা যখন দুঃখ-প্রকাশ করে যে সবাই তাকে 'চোর' বলে, মুহূর্তে গদু প্রধানের আস্ফালন শোনা যায়—

—কোন্ শালা কয়? দেইক্যা নেই তার গর্দানে কয় মাথা।[১২]

সত্যি তো কারো তো ঘাড়ের উপর একটা ছাড়া দুটো মাথা নেই যে তারা এর প্রতিবাদ করবে, নিজেদের প্রাপ্য জোর করে আদায় করে নেবে। তাই তো তাদের মুখ বুজে ফিরে যাওয়া। কেবল হয়তো শ্লেষ মাখানো উক্তি করা—

আপনেরাই ঈদ করেন। আপনেগ দিন দিছে খোদায় — ঈদ করতে দিছে।[১৩]

এর বেশি কিছু বলার বা করার ক্ষমতা তাদের নেই; কেননা এ সমাজে এদের অধীনে এদের প্রবর্তিত নিয়ম-কানুন মেনে তাদের বাস করতে হয়, এদের জমি চাষ করেই তাদের আহার জোটে, এদের কাছে তাদের জীবন-জীবিকা বাধা পড়ে আছে। প্রতিবছর এদের জমির ধান কাটে তারা 'ছয়ভাগা' কিংবা 'সাতভাগা'য় — তবেই হয়ত সারা বছর একবেলা অন্ন জোটে সুতরাং প্রতিবাদী হবার মতো অবস্থান তাদের নয়। তাদের এই নীরবতা এদের স্পর্ধা আরও বাড়িয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ যখন চালের দাম বাড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন তখন গদু প্রধানের কামনা — 'চালের দর চড়ুক।'[১৪] 'ম্যাজিস্টর' সাহেব যখন বাজারে ঢোল দেয় যে 'নয় আনার বেশী এক সেরের দাম নিলে জরিমানা অইব'[১৫] ,তখন বাজারে আর চাল খুঁজে পাওয়া যায় না, মহাজনেরা গোলায় চাল লুকিয়ে ফেলে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে; নিরুপায় মানুষকে 'বারো ছটাক বারো আনা' দরে চাল কিনতে হয়। মহাজন-জোতদার-জমিদার শ্রেণির সামাজিক শোষণ এবং নিরুপায় কৃষিজীবী শ্রমজীবী মানুষের অসহায়ত্ব অর্থাৎ সমাজবাস্তবতাকে ঔপন্যাসিক চমৎকারভাবে রূপায়িত করেছেন।

শ্রমবিভক্ত সমাজে যেমন শ্রমজীবী মানুষের শোষণের চিত্র পাওয়া যায়, তেমনি পুরুষ-শাসিত সমাজের পটভূমিতে পাওয়া যায় নারী নির্যাতনের চিত্র। নারী একদিকে যেমন সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তেমনি ঘরের পুরুষ দ্বারা নির্যাতিত, নিপীড়িত। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর অসহায়ত্ব-অনিশ্চয়ত্বের চিত্র মূর্ত হয়েছে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে বিভিন্নভাবে। এ উপন্যাসে বর্ণিত সমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথার উল্লেখ আছে। বিনা দোষে জয়গুনকে তালাক দেয় করিম বক্‌শ, মায়মুনকে স্বামী-গৃহ থেকে বিতাড়িত করা হয় অল্পবয়স এবং কর্মে অপটু হবার কারণে। জয়গুনকে তালাক দিয়ে দুই কন্যাসহ বাড়ি থেকে বিতাড়িত করলেও তিন বছরের পুত্র-সন্তান কাসুকে রেখে দেয় করিম বক্‌শ সমাজের এই নীতি নির্দেশে—

> পুত্র সে হাতের লাঠি বংশের চেরাগ।
> কন্যা সে মাথার বোঝা কুলে দেয় দাগ।[১৬]

ক্ষুধার যন্ত্রণায় এক কন্যার মৃত্যু ঘটলে বা নিজ কন্যার বিবাহে কেবল বাপ হিসেবে উপস্থিত থাকার আহ্বান এলে তা সহজে উপেক্ষা করতে পারে করিম বক্‌শ — কেননা এ সমাজে কন্যা সন্তানের প্রতি কোনো মমতা বা নারীর প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান অবশিষ্ট নেই। নারীরা এ সমাজে কেবল উপকরণ বা সন্তান লাভের উপায় বলে বিবেচিত। জয়গুনের 'গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা-কাচ্চা পেড়ে ধরনের বয়স' আছে এবং শরীরটাও শক্ত-সমর্থ বলেই না গদু প্রধান তার চতুর্থ বিবি হবার প্রস্তাব দেয় তাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ধনী-গৃহে একাধিক স্ত্রী রাখার বিধান কেবল জৈবিক কামনা-বাসনার প্রকাশই নয়, এক ধরনের সুযোগ-সন্ধানী কৌশলও বটে। ধনী অর্থাৎ অঢেল জমির মালিকের গৃহে কাজ করবার লোক দরকার প্রচুর। ধান ক্ষেতে যেমন পুরুষেরা পরিশ্রম করে, তেমনি ধান কাটার পর তা মাড়াই করা, সেদ্ধ করা, ঢেঁকি ভানা এবং চাল ঝেড়ে ব্যবহার উপযোগী করা — সমস্ত কাজ নারীদের। ধনী গৃহস্থের বহুবিবাহ তার আর্থিক স্বচ্ছলতার একটি উপকরণমাত্র। এ প্রসঙ্গটি উপন্যাসে ইঙ্গিতবহ হয়ে এসেছে গদু প্রধানের বিবাহ প্রস্তাব ব্যাখ্যায় শফির মার উক্তিতে—

> দশ মরাই ধান পায় বচ্ছরে। জাগা-জমিনের হিসাব কিতাব নাই। কাম আছে মানি। তয় আমি কই, যেইখানে কাম আছে হেইখানে ভাতও আছে। আর তোর ত একলা কাম করতে অইব না। আগের তিনডা জননা আছে পরধানের। চাইড্যা পোলার বৌ আছে।[১৭]

গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক হলেও অর্থোপার্জনের স্বাধীনতা নেই। জয়গুনকে বারবার সমাজের নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হয়েছে, ধর্মীয় বিধি নিষেধ আরোপিত হয়েছে কেবল কি 'বেপর্দা' হয়ে চলাফেরার জন্য? স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জন করে সে যে কোনো পুরুষের সাহায্য ছাড়াই জীবন-যাপন করছে — এ ভাবনা কি ক্রিয়াশীল ছিল না সমাজপতিদের মনে? অর্থোপার্জনের মাধ্যমে নারীরা স্বকীয়তা অর্জন করবে এবং তাতে স্বার্থহানি ঘটবে পুরুষ-সমাজের — এ আশঙ্কা কি জাগে নি তাদের মনে? এ প্রশ্নের উত্তর আপাতদৃষ্টিতে উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ধর্মীয় বিধি-নিষেধের যৌক্তিকতা বা উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর অনুমান করা কঠিন নয়।

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসে নারীর সামাজিক অবস্থান চিত্রণের প্রত্যক্ষ দলিল হিসেবে শারীরিক নির্যাতনের কাহিনী আছে। করিম বক্শ তার প্রথম স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা মেহেরনকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছিল রাত-দুপুরে যাত্রাগান শুনে আসা স্বামীকে 'দরজা খুলে দিতে দেরি হয়েছিল' বলে। তারপর সেই হত্যাকে আত্মহত্যায় রূপ দিতে মেহেরনের 'গলায় রশি বেঁধে গাবগাছে লটকিয়ে' দিয়েছিল। 'হাজার খানেক টাকা খরচ' করে সে ঘটনাকে ধামাচাপা দিতেও কোনো অসুবিধা হয় নি। মেহেরনের হত্যার প্রতিবাদ কেউ করে নি, নারীর অবস্থান এতই গৌণ এ সমাজে। প্রথম স্ত্রী হত্যার পর করিম বক্শ দমে যায়নি; দ্বিতীয় স্ত্রী জয়গুনের ওপরও 'তার বাহুবলের কসরত চলে ছয় বছর।' বৈবাহিক জীবনে স্বামীর কাছ থেকে কেবল অমানবিক আচরণ ও শারীরিক নির্যাতন পেয়েও জয়গুন কোনো প্রতিবাদ করে নি, সহ্য করেছে। তার এই সহনশীলতা সে লাভ করেছে ধর্মীয় অনুশাসন ও স্বসমাজ থেকেই। আবহমান কাল থেকে স্বামীদের এই অত্যাচার চলে আসছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুরুষশাসিত সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসন। স্ত্রী-নির্যাতন ধর্মসম্মত বলে প্রচলিত এ সমাজে। নারী হয়েও জয়গুনের শাশুড়ি তার পুত্রের আচরণকে সমর্থন করে বলেছে—

> মরদ্ গনে যেই পিড়ে মারব, হেই পিড বিস্তে যাইব। যেই আতে, যেই পায় মারব, বেবাক বিস্তে যাইব।[১৮]

নারী নির্যাতন ও দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে ধর্মকে। জয়গুনের শাশুড়িও হয়ত এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জীবন কাটিয়েছে। জয়গুনের শাশুড়ি, জয়গুন এবং জয়গুনের কন্যা মায়মুন এই তিন প্রজন্মের তিন নারী নির্যাতনের কাহিনী বহু প্রজন্মের নারীর অসহায়ত্ব এবং সমাজে তাদের অবস্থানকে নির্দেশ করছে।

অসীম ক্ষমতাধর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস মানবসমাজের সুপ্রাচীন বৈশিষ্ট্য। যুক্তির পাশাপাশি মানব-মনের অযৌক্তিক ভাবনার অস্তিত্ব মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ধারাবাহিকতায় নানান ধরনের সংস্কার বা বিধি-নিষেধ তৈরি করে জীবন-যাপনকে সুস্থিত বা নিয়মতান্ত্রিক করার প্রচেষ্টা চালায়। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, সমাজ-বিকাশের সুদীর্ঘ ধারাবাহিক নানা রকম সংস্কার, প্রথা এবং আইনের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে এসব বিধি-নিষেধ।[১৯] মানব-সত্তার শেকড়ে প্রোথিত এসব বিধি-নিষেধ কালক্রমে অজ্ঞানতার আধারে ছেয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করেছে মানুষকে, বিষিয়ে তুলেছে তাদের জীবনকে। গ্রামীণ-জীবনের এই দিকটির ওপর বিশেষ আলোকসম্পাত করেছেন ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক তাঁর *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে। এ উপন্যাসের নামকরণেই তার প্রমাণ মেলে। গ্রামের বেশির ভাগ বাড়িই উত্তর-দক্ষিণ প্রসারী; পূর্ব পশ্চিমে প্রসারী বাড়ি খুবই কম। পূর্ব ও পশ্চিমে অর্থাৎ সূর্যের উদয়াস্তের দিকাভিমুখী বাড়ি হলে সকালে যেমন সূর্যের প্রখর তাপ সহ্য করতে হয়, বিকেলেও তেমনি। তাছাড়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে সূর্যের কিরণ তির্যকভাবে এসে পড়ে। সূর্যাভিমুখী হয়ে কাজ-কর্ম করা যেমন কষ্টকর তেমনি চোখের জন্যেও ক্ষতিকর। আরামদায়ক আলো-বাতাস উত্তর-দক্ষিণমুখী বাড়িতেই উপভোগ্য। এ সমস্ত কারণে

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী বাড়ি তৈরি করতেন না। লোকায়ত মনীষার একটি ফল এটি। বচন অনুযায়ী—

দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা,
পূর্বদ্বারী তার প্রজা
পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই,
উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই।

ক্রমে এটি একটি নিষেধাজ্ঞা বা 'ট্যাবু'তে পরিণত হয়, কিন্তু মানুষ যখন যুক্তি ছেড়ে যুক্তিহীনতার দিকে অগ্রসর হয় তখন এই লৌকিক সংস্কারই ভীতিকর কুসংস্কারে পরিণত হয়। যে-কারণে আলোচ্য উপন্যাসে সূর্য-দীঘল বাড়ির 'ভীতিজনক' ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় এবং এ ধারণা জন্মায় যে, এ বাড়িতে বাস করলে নির্বংশ হতে হবে—

> এখানে এক সময়ে লোক বাস করত, সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা বংশ রক্ষা করতে পেরেছিল কিনা কেউ জানে না। তবুও লোকের ধারণা, সূর্য-দীঘল বাড়ীতে নিশ্চয়ই বংশ লোপ পেয়ে থাকবে। নচেৎ এরকম বিরান পড়ে থাকবে কেন?[২০]

তাদের এ অনুমান-নির্ভর বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা। খাদেম নামক এক ব্যক্তি এ বাড়িতে বসবাস কালে তার একজোড়া ছেলে-মেয়ে পানিতে ডুবে মারা গেলে অন্ধবিশ্বাস ভূমির গভীরে তার শেকড় খুঁজে পায়। তাতে ডাল পালা গজিয়ে মহীরুহ হয়ে উঠতে সহায়তা করে গদু প্রধান ও রহমত কাজী অর্থাৎ সমাজের ক্ষমতাবান কিছু মানুষ,যারা তাদের প্রত্যক্ষ অলৌকিক অভিজ্ঞতার বর্ণনে গ্রামীণ মানুষের চেতনার গভীরে ভীতি স্থাপন করে এবং সুযোগ মতো সে ভীতিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

অবশ্য এমন সংস্কারের সন্ধান পাওয়া যায় এ উপন্যাসে যা কুসংস্কারে পরিণত হয়নি। যেমন — 'বাচ্চা-কাচ্চার মা, রাত-বিরাতে গাছের ফল-পাতা ছিঁড়তে নেই।' এ কারণে জয়গুন নিজে না ছিঁড়ে হাসুকে রাতের বেলা কুমড়ো পাতা তুলে আনতে বলে। এই নিষেধাজ্ঞা ক্ষতিকারক তো নয়ই বরং রাতের বেলা শ্বসনে প্রবৃত্ত বৃক্ষাদি রক্ষায় বেশ কার্যকর । গ্রামীণ আরও কিছু সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়,যা 'কু' অর্থাৎ ক্ষতিকর নয়। যেমন — ভয় পেলে সোনা-রূপা ধোয়ানো পানি দিয়ে ভীত ব্যক্তিকে গোসল করানো, বড়শিতে মাছ না উঠলে বড়শি পুড়িয়ে নেয়া, মাছ ধরতে গিয়ে পৌনঃপুনিক ব্যর্থতায় পরনের কাপড় উল্টো করে পরে ভাগ্য সুপ্রসন্ন করার চেষ্টা ইত্যাদি। এ ধরনের সংস্কার, বিধি-নিষেধ নিয়েই আবহমান কালের গ্রামীণ জীবন।

অলৌকিক অস্তিত্ব তথা ভূত-প্রেতের প্রতি গভীর বিশ্বাস রয়েছে গ্রামের মানুষের মনে। গ্রামে বাঁশঝাড়, তেতুঁল, শিমুল ও গাবগাছ বেশি দেখা যায় — কেননা এ গাছগুলো কোনো পরিচর্যা ছাড়াই জন্মে ও বেড়ে ওঠে ঝাকড়া হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে তলদেশ। এ কারণে 'গ্রামের লোকের বিশ্বাস — এই গাছগুলোই ভুত-পেত্নীর আড্ডা'[২১] গ্রামীণ কোন মানুষই তাদের বসত বাড়িতে এ গাছগুলো লাগায় না কিন্তু দেখা যায় পাখিবাহিত বীজে বা অন্য কোনো উপায়ে বাড়ির বা রাস্তার ধারে অনাহূতভাবেই বেড়ে ওঠে এরা।

গ্রামীণ মানুষের মনোজাগতিক এই ভয়কে আরও উস্কে দিতে এক শ্রেণির ভণ্ড ফকির সক্রিয়। তারা নিজেদের অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে দাবি করে এবং জ্বিন-ভূতকে বশীভূত করার ভেলকিবাজি দেখায়। জীবিকার প্রয়োজনে এবং প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য এরা গ্রামবাসীর মনের ভয়কে আরো জোরদার করে। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের শুরুতেই জনৈক জোবেদ আলী ফকিরের প্রসঙ্গ এসেছে। এই ফকির অপয়া জ্বিন-ভূতের আড্ডা সূর্য-দীঘল বাড়িকে বাসযোগ্য করে দেয় চারকোণে চারটা তাবিজ পুঁতে। বিনিময়ে সে গ্রহণ করে ভিক্ষার সোয়া সের চাল, পাঁচ আনা পয়সা। অবশ্য তাতেও তার 'মন ওঠে না।' সে দাবি করে একজোড়া 'বড়ুড়া বাঁশ' এবং 'একটা পিতলের কলসী'। নিজের প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখতে সে জানায়—

> বছর বছর কিন্তু পাহারা বদলাইতে অইব। যেই চাইরজন এইবার রাইখ্যা গেলাম, হেইগুলা কমজোর অইয়া যাইব সামনের বচ্ছর। বোঝতেই পার, দিনরাইত ভূত-পেত্নীর লগে যুদ্ধ করা কি সোজা কাণ্ড।"[২২]

ফকিরের দাবির অসারতা সহজেই অনুমেয়। জয়গুনের দিকে লোভের হাত বাড়াতে গিয়ে যখন চুন-মাখানো মুখ নিয়ে এ বাড়ি ত্যাগ করতে হয় — আর সে এ বাড়ি মুখো হয় না — তার পাহারাদার ছাড়াই নির্বিঘ্নে এ বাড়িতে জয়গুনদের দিন কাটে, যদিও শফির মা সর্বদাই শঙ্কিত থাকে, কিন্তু গদু প্রধানের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত কোন অলৌকিক শক্তির উপস্থিতির চিহ্ন পাওয়া যায় না।

উপন্যাসের শেষাংশে আবার জোবেদ আলী ফকিরের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। জয়গুনকে শায়েস্তা করার জন্য গদু প্রধান যখন জয়গুনের ঘরের চালায় ঢিল ছুঁড়ে ভূত-প্রেতের বিশ্বাসকে জীবন্ত করে তোলে, তখন করিম বক্‌শ 'একটা পেতলের কলসী কিনে দিয়ে এবং অনেক হাতে-পায়ে ধরে জোবেদ আলী ফকিরের রাগ মাটি' করে। ফকির তাকে দেয় মন্ত্রসিদ্ধ চারটা গজাল যা অমাবস্যার মধ্যরাতে বাড়ির চারকোণে পুঁতে বাড়িকে ভূত-মুক্ত করা যাবে। সে কাজ করতে গিয়েই গদু-প্রধানের অপকর্ম দেখে ফেলায় অপমৃত্যু ঘটে করিম বক্‌শের। সমালোচকের মতে — "করিম বক্‌শের মৃত্যু ঔপন্যাসিক পরিণামের কারণ হিসেবে দুর্বল।"[২৩] কিন্তু ঔপন্যাসিকের যে জীবনদর্শন কুসংস্কারের স্বরূপ উদ্ঘাটন — তার সিদ্ধিতে এই পরিণাম অনুপযুক্ত নয়। বস্তুত গ্রামীণ মানুষ যে চিরকালই কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের ক্রীড়নক হয়ে থাকে এবং এ ধারার প্রতিকূলে কোনো একক ব্যক্তি যে টিকতে পারে না বরং অন্ধ-বিশ্বাস টিকে থাকে যুগ যুগান্তর ধরে — গ্রামীণ-জীবনে বিদ্যমান এ সত্যটি ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন এ উপন্যাসে। নামকরণে ঔপন্যাসিকের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত এবং উপন্যাসের আদি-অন্তে এ সত্য উন্মোচনে ঔপন্যাসিকের সযত্ন পরিচর্যা শিল্পরূপ লাভ করেছে।

আবহমানকাল থেকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামগুলোতে রোগে-শোকে পানি পড়া, তাবিজ পড়া এবং চিকিৎসকের পরিবর্তে এক শ্রেণির ফকিরের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবণতা প্রচলিত। এ উপন্যাসে এ ধরনের অপচিকিৎসার করুণ-মর্মান্তিক বিবরণ রয়েছে। কাসুকে ছালাবুড়ি, গোঙ্গাবুড়ির মিথ্যে ভয় দেখিয়ে করিম বক্‌শ যখন তার মার বাড়ি যাওয়া থেকে নিরস্ত করে তখন শিশুমনের আতঙ্ক প্রবল হয়ে ওঠে — কাসু পড়ে কঠিন অসুখে। কাসুর অসুখকে গ্রাম্য

ফকির দিদার বক্‌শ ভূতের আছড় বলে অভিহিত করে অসুস্থ কাসুর নাকের ভেতর দড়ি পোড়া ঢুকিয়ে দেয়, তার এক শাকরেদের উপর ভূতের চালান দিয়ে ভূত দূর করার মিথ্যে নাটক সাজায় এবং জ্বরাক্রান্ত কাসুকে সাত ঘাটের পানি দিয়ে গোসল করিয়ে অসুস্থতার তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দেয়। 'ডাবল নিউমোনিয়া' আক্রান্ত কাসু যখন মৃত্যুর দোরগোড়ায় তখন খবর পেয়ে জয়গুন এসে ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে কাসুকে সুস্থ করে তোলে। কাসুর অসুস্থতা এবং জয়গুনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে তার বেঁচে ওঠা কাহিনীতে গতি এনেছে, ঘটনার মোড় পরিবর্তিত করেছে। উপাখ্যানটি রচনার পেছনে সামাজিক কুসংস্কার, অপচিকিৎসার বিরুদ্ধে লেখকের মনোভাব সুস্পষ্ট — লেখক যেন অপচিকিৎসার বিপরীতে আধুনিক চিকিৎসার প্রচলন এবং সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন।

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসের চরিত্র-সৃজনে ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং জীবন দর্শনের সমন্বয়ে যে চরিত্রগুলো সৃজন করেছেন আমাদের সমাজে তারা দুর্লভ নয়। বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজে জয়গুন, শফির মা, মায়মুন, হাসু, গদু প্রধান — এদের দেখা মেলে সহজেই অর্থাৎ এ চরিত্রগুলো কেবল উপন্যাসের ফ্রেমেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; সরস ও জীবন্ত হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে স্বকাল ও স্ব-সমাজের।

জয়গুনের গ্রামে ফেরার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সূচনা, গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি এবং মধ্যবর্তী সময়ে তার বেঁচে থাকার সংগ্রামই এ উপন্যাসের উপজীব্য। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে মূলত জয়গুনকে কেন্দ্র করেই ঔপন্যাসিক বৃহত্তর সমাজ-বাস্তবতা বয়নে ব্রতী হয়েছেন। একদিকে দেশবিভাগের মত সাম্প্রতিক ঘটনা, অন্যদিকে চিরায়ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম, বৈষম্য ও শোষণে জারিত রক্ষণশীল গ্রামীণ-সমাজ। এই দুই কাল পরিসরে সচল জয়গুন সত্তা শোষিত-নির্যাতিত হলেও আত্মসচেতনাতে বিশেষভাবে উজ্জ্বল। জয়গুন নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর এক অসহায় নারী। 'পান্তাভাত', 'পোড়ামরিচ' তাদের নিত্যদিনের আহার্য এবং এ খাবারটুকু জোগাতেই নিম্নবর্গীয় মানুষের মতো তার পথচলা। জয়গুন এবং তার সমগোত্রীয় মানুষের জীবন সম্পর্কে একজন সমালোচক লিখেছেন—

> জয়গুনরা যে জীবন যাপন করে, তাকে মানুষের জীবন যাপন বলে স্বীকার করতে আমি রাজি নই — এমন কি তাকে গৃহপালিত পশুস্তরের জীবন বলে মেনে নেওয়াও শক্ত।[২৪]

এ মূল্যায়ন অতিরঞ্জিত নয়, বাস্তব; কিন্তু এও সত্য যে এই অসহ বাস্তবতার বলয়ে বন্দি গ্রামীণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। জয়গুনের যে জীবন-যাপনের চিত্র ঔপন্যাসিক এঁকেছেন তা নিম্নবর্গীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবন। একজন নারী হিসেবেও সামাজিক নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার জয়গুন। সমালোচকের মতে Ñ

> স্বামী-পরিত্যক্ত নিঃস্ব জয়গুন পূর্ববঙ্গের গ্রামের অসংখ্য দরিদ্র নারীর প্রতিনিধি, যারা দৈনন্দিন জীবনের টানা-হ্যাঁচড়ায় ক্লান্ত, বিপন্ন। সামাজিক নির্যাতন-অস্বীকৃতির মধ্যে তার অস্তিত্বের সামান্যতম মূল্য কোথায়ও গ্রাহ্য হয় নি। বাংলাদেশের উপন্যাসেই প্রথম তারা পেল সাহিত্যিক স্বীকৃতি। আবু ইসহাকের উপন্যাসে জয়গুনের গুরুত্ব এতটাই যে, পুরো সমাজের বিশ্লেষণ চলেছে তাকে কেন্দ্র করে।[২৫]

জীবিকার তাগিদে 'বেপর্দা' হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে জয়গুনকে সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। স্বামী-পরিত্যক্তা জয়গুনের দিকে লোভের হাত বাড়িয়েছে জোবেদ ফকির থেকে গ্রাম্য সমাজপতি গদু প্রধান পর্যন্ত। সমস্ত প্রতিকূলতা ঠেলে স্রোতের বিপরীতে পথ চলেছে জয়গুন — তবুও হার মানে নি। আত্মজার বিয়েতে সাময়িকভাবে তওবা করে কিছুদিন নিষ্ক্রিয় থাকলেও সন্তানদের বাঁচানোর তাগিদে আবারও আত্মপ্রত্যয়ী জয়গুন জীবিকার সন্ধানে পথে নেমেছে। জয়গুন দৃঢ়তা, প্রত্যয় এবং বিদ্রোহী চেতনার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবন-ধারণের অমিত প্রত্যয়ে জয়গুন সমগ্র সমাজের বিপরীতে অবস্থান করেছে। বারবার ভেঙেছে ধর্মীয় তথা সামাজিক নিয়ম, প্রতিপক্ষ করে তুলেছে সমাজকে, মিত্র তার কেউ নেই — কোন অবলম্বন ছাড়াই মুখোমুখি হয়ে সংগ্রাম করেছে সে সমাজের মোড়লদের সঙ্গে। সমালোচকের মতে,"নিজের স্বাধীন সত্তার বিকাশে ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে অন্তরের শক্তি ছাড়া জয়গুনের আর কোন অবলম্বন নেই।"[২৬] এই 'অন্তরের শক্তি'র স্বরূপ কী? কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির বলে বলীয়ান হয়েছে জয়গুন? — নিঃসন্দেহে মাতৃত্ব। জয়গুনের সকল শক্তি, সকল বৈশিষ্ট্যের উৎস তার মাতৃত্ব। তাকে যতই বিদ্রোহী বা সংগ্রামশীলতার প্রতীকে প্রতীকায়িত করা হোক না কেন তার বিদ্রোহ বা সংগ্রাম মাতৃত্ব থেকেই উৎসারিত। জয়গুনকে বলা যেতে পারে মাতৃত্বের Archetype .

'Racial Memory' বা 'Primitive Form' যেভাবেই অভিহিত করা হোক না কেন জয়গুনের মাতৃত্ব চিরায়ত মাতৃত্ব। মানব সভ্যতার সূচনা থেকে 'মাতৃত্ব' ধারণাটি যেভাবে বিকশিত, বিশ্লেষিত, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে, সে-বিবেচনায় জয়গুনকে মাতৃত্বের Archetype অভিধায় অভিহিত করা যথেষ্ট যুক্তিসংগত। জয়গুনের মাতৃমূর্তিকে সমকালীন সাহিত্যের বিভিন্ন মহৎ চরিত্র তো বটেই বিশ্বসাহিত্যের কিছু শক্তিশালী চরিত্রের সমলগ্ন বিবেচনা করাও অতিরঞ্জিত মনে হয় না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালীর* সর্বজয়া, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জননী* উপন্যাসের শ্যামা, শওকত ওসমানের *জননী*-র দরিয়া বিবি, ম্যাক্সিম গোর্কির *মা* উপন্যাসের মা কিংবা জন স্টাইনব্যাকের *দ্য গ্রেপস্ অভ র‍্যথ* উপন্যাসের 'মা' যেমন শক্তি ও সাহসিকতায় সকল নির্যাতন-নিপীড়ন এবং অভাবের সঙ্গে লড়াই করেছে সন্তানকে বাঁচানোর তাগিদে, একইরূপে ভিন্ন পটভূমিতে *সূর্য-দীঘল বাড়ীতে* আবির্ভূত হয়েছে জয়গুন।

দুর্ভিক্ষ-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জয়গুন এক নয়; সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। জীবনের শুরুতে পরহেজগার স্বামী জব্বর মুনসীর প্রভাবে জয়গুন ছিল পর্দানশীন। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্বামী করিম বক্‌শের গৃহে ছয় বছর কেটেছে তার অমানবিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনায়। দুর্ভিক্ষের শুরুতে দুর্নামের ভয়ে স্বামী পরিত্যক্তা জয়গুন ঘরের বের পর্যন্ত হয় নি, কিন্তু যখন খেতে না পেয়ে তার কোলের মেয়েটি মারা যায় এবং মরণাপন্ন হয় তার অপর দুই সন্তান তখন লোক লজ্জা ভুলে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে সে তার সন্তানদের বাঁচানোর প্রয়াসে। তার মাতৃত্ববোধই তাকে উজ্জীবিত করেছে ঘরের বের হতে, সমাজের বিধি-নিষেধ ভুলে লড়াই করতে, ক্ষুধার অন্ন যোগাতে—

> হাসু ও মায়মুনকে নিয়ে ভেসেই চলছিল। কিন্তু নিজের চেষ্টায় অকূল পাথারে কূল সে পায়। লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। তাকে বাঁচতে হবে, ছেলেমেয়েদেরে বাঁচাতে হবে — এই সঙ্কল্প নিয়ে আকালের সাথে পাঁচ বছর সে লড়াই করে আসছে।[২৭]

গদু প্রধানকে বিয়ে করার লোভনীয় প্রস্তাব সে ফিরিয়ে দিয়েছে ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। 'দুই কানি জমিন আর একখান ঘর'[২৮] লিখে দিতে চেয়েছিল গদু প্রধান। বিত্তশালীর গৃহিণী হবার সুবাদে নিত্যদিনের খাবার যোগানোর ভাবনাও তার মিটত। কিন্ত তার দৃঢ় উত্তর—

> পোলা মাইয়ার মোখ চাইয়া আর পারুম না, মাপ করো। পোলা আর মাইয়ার বিয়া দেইখ্যা যেন চউখ বুজতে পারি, দোয়া কইর‍্যো। [২৯]

তিরিশের কাছাকাছি বয়স যে নারীর — প্রৌঢ়ত্বের ছায়া এখনও যার দেহে পড়ে নি — জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত সে নারীর হতাশার সুর শোনা যায় জয়গুনের কণ্ঠে। জীবনের সকল আশা, সকল সাধ বিসর্জন দিয়ে কেবল ছেলে-মেয়ের সুখীসমৃদ্ধ জীবন তার কাম্য। মাতৃত্বের এই শাশ্বত রূপ সকল কালে সকল সমাজে মহৎ রূপে আবির্ভূত হয়; মানব জীবনের মহিমাকে সমুন্নত করে।

ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করায় তার পাঠানো দ্রব্য মসজিদের ইমাম গ্রহণ করে নি বরং ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তাকে একঘরে করে রাখা হয়েছে। লোকোপবাদে জয়গুন বিব্রত হয় নি, সে নিষেধাজ্ঞা মানে নি বরং দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছে—

> খাইট্যা খাইমু। কেওরডা চুরি কইর‍্যাও খাই না, খ'রাত কইর‍্যাও খাই না। কউক না, যার মনে যা।[৩০]

পরক্ষণে তার মনে পাপবোধ জেগেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ মানুষের মতো জয়গুন প্রকৃতপক্ষে ধর্মভীরু। বাড়ির বাইরে গিয়ে পুরুষদের মাঝ দিয়ে হেঁটে বেড়ানোয় তার যে পাপ হয়েছে সে তা বিশ্বাস করে এবং এও বিশ্বাস করে যে, এজন্য তাকে দোজখে যেতে হবে এবং কঠোর শাস্তি পেতে হবে। পুঁথি পড়ে শোনা দোজখের শাস্তির বিবরণ তার মনে অসম্ভব ভীতি জাগিয়ে তোলে কিন্তু ছেলে-মেয়েকে বাঁচানোর তাগিদের কাছে পরাজিত হয় সে ভীতি। ধর্মীয় অনুশাসনের চাইতে মাতৃত্বই প্রবল হয়ে ওঠে—

> ছেলে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে মমতায় তার বুক ভরে ওঠে। দুটি কচি মুখ। এদের বাঁচাতেই হবে। ধর্মের অনুশাসন সে ভুলে যায় এক মুহূর্তে। জীবন-ধারণের কাছে ধর্মের বারণ তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায় তার কাছে।[৩১]

গভীর আত্মপ্রত্যয়ে ধর্মের বারণ তুচ্ছ করে সন্তানদের জীবন-রক্ষার্থে সে পথে নামে। সামাজিক সব বিরূপতা যাকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে না, সন্তানের মঙ্গলার্থে সেও একসময় নতি স্বীকার করে; মায়মুনের বিয়েতে তওবা করতে বাধ্য হয় জয়গুন। বিবাহের আসরে যখন গদু প্রধানের প্ররোচনায় জয়গুনের তওবা করার প্রস্তাব ওঠে তখন সে অসম্মতি জানায়, কেননা তার ক্ষেত্রে তওবা করার অর্থ হল 'না খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরা।'

লড়াই করে বাঁচতে অভ্যস্ত জয়গুন হাতপা বেঁধে ঘরে বন্ধ থেকে নিজেকে এবং সন্তানদের সুনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে চায় নি। তাই সে স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করে—

না, আমি তোবা করতাম না।[৩২]

এ পরিস্থিতিতে তাকে যখন প্রলুব্ধ করা হয় যে, আজকের দিনের মতো তওবা করে নিতে, পরে না মানলেই হলো, তাতেও তার আপত্তি—

তোবা, তো'বা-ই। একবার করলে তা আর ভাঙতে পারতাম না।[৩৩]

নিম্নবর্গের নারী হলেও ব্যক্তিত্বের ঋজুতা এবং সততা প্রকাশিত তার এ উক্তিতে। সমাজে যখন কপটতার প্রদর্শনী চলছে, রাজনৈতিক পর্যায়ের সব প্রতিশ্রুতি যখন ধুলোয় মিশেছে, ব্যক্তি-প্রতিশ্রুতির তখন কি-ই বা মূল্য থাকতে পারে? কিন্তু জয়গুনের নিকট তার প্রতিশ্রুতির মূল্য অসীম। সে কপট নয়; তাই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভাঙা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মানব-মহিমার সর্বোচ্চ চূড়ায় তার অবস্থান। অবশ্য একসময় তওবা তাকে করতে হয়। কেননা যে-সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা নেই সে-সমাজের লোকের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ছাড়া তার কন্যার বিয়ে সম্ভব নয়; অথচ সমাজের চোখে সে ঘৃণিত। কেননা সমাজের লোকের ধারণা—

পর্দা না মানলে চল্লিশ বছরের এবাদতও কবুল হয় না খোদার দরগায়। সব বরবাদ অইয়া যায়। বেপর্দা স্ত্রীলোক আর রাস্তার কুত্তী সমান।[৩৪]

তওবা করার পর অবশ্য এই 'রাস্তার কুত্তী সমান' জয়গুনের খাবার খেতে কারও আপত্তি হয় না, কেননা তওবা করার সঙ্গে সঙ্গে সে পরিশুদ্ধ বিবেচিত হয় সামাজিক দৃষ্টিতে।

নিজ প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রাখতে জয়গুন সর্বংসহা হয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করেছে কিন্তু ঘরের বের হয় নি। কাসুর অসুস্থতার সময়ে করিম বক্‌শের বাড়ির খাবার সে স্পর্শ করে নি। প্রবল আত্মসম্মানবোধের পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন সে না খেয়ে বা হাসুর এনে দেয়া খাবারের কিছু অংশ খেয়ে কাটিয়েছে। পরবর্তী সময়ে বাড়ির ফলজ ও বনজ গাছ বিক্রি করে সন্তানদের মুখে খাবার দেয়ার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়েছে এবং একেবারেই নিঃস্ব হলে সন্তানদের বাঁচানোর তাগিদেই তওবার প্রতিশ্রুতির শৃঙ্খল ভেঙে পর্দার সংকীর্ণতাকে ত্যাগ করে উদার উন্মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে ইহকাল ও পরকালের সব ভীতিকে উপেক্ষা করে। সন্তানদের নিশ্চিত মৃত্যু প্রত্যক্ষ না করে প্রতিশ্রুত প্রায়শ্চিত্তের বন্ধন ছিন্ন করে আবারও পথে নেমেছে নতুনবোধে উজ্জীবিত হয়ে —

হাতে পায়ে তাকত থাকতে কেন সে না খেয়ে মরবে? ক্ষুধার অন্ন যার নেই, তার আবার কিসের পর্দা, কিসের কি? সে বুঝেছে , জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র। জীবন রক্ষা করতে ধর্মের যে কোন অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নিবাতে দোজখের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তার ভয় নাই।[৩৫]

জীবনের প্রতিবন্ধক হিসেবে ধর্মের অবস্থান নয়, ধর্ম জীবন-যাপনের সহায়ক; অথচ প্রচলিত ধর্মীয় প্রথায় মানবতা নয়, অমানবিক নিয়ম-নীতিই প্রাধান্য পায়। এই কঠোর নীতি-নির্ভর,

মানবতা-বিবর্জিত ধর্মীয় অনুশাসন কতিপয় ধর্ম-ব্যবসায়ীর স্বার্থ-রক্ষার হাতিয়ার-মাত্র; কখনওই পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান নয়। বাংলাদেশের নিরক্ষর-সরল-অসহায় মানুষের ধর্মভীরুতার সুযোগে স্বার্থান্বেষী এক দল মানুষ যে নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো ধর্মের অপব্যখ্যায় জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, তার চিত্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র *লালসালু* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে এসেছে। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় জয়গুনের জীবন-যাত্রা; সে-সূত্রে ধর্মীয় অসারতা প্রমাণের সুযোগও পেয়েছেন ঔপন্যাসিক এবং জয়গুনের ধর্মীয় অপ-সংস্কার মুক্তির মাধ্যমে তার প্রতিকারের উপায়ও তিনি কল্পনা করেছেন। ক্ষুধার্ত জয়গুন-সত্তা ঈশ্বরহীন এক বিরূপ প্রান্তরে নিপতিত। তাকে উদরের আহার জোগাড় করতে হয় কায়ক্লেশে, একান্ত নিষ্ঠুর শ্রমে। অধিবিদ্যাগত কোনো শক্তি তার সংকটের কোনো অলৌকিক সমাধান নিয়ে আসবে তা সে ভাবে না।

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসে আবু ইসহাক জয়গুনের সংগ্রামশীলতার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনকে চিত্রিত করেছেন। জয়গুনের নিঃস্বতার বাস্তবতাই সবচেয়ে বড়ো সত্য, তবে জয়গুন সকল নিঃস্ব মানুষের প্রতিনিধি হয়েও লেখকের মানসকে ধারণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে। জয়গুনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় হাজার বছরের সংস্কারমুক্তির সাহসিকতা। উপন্যাসের শুরুতে জয়গুন সন্তানসহ বাস করতে আসে যে বাড়িতে — গ্রামের লোক কুসংস্কারজনিত ভীতিতে সে-বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন সকল ভীতিকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস হয়ত জুগিয়েছে বা জোবেদ আলি ফকিরের মন্ত্রপূত তাবিজ সাময়িকভাবে তাদের মনস্থির করতে সহায়তা করেছে — এ কথা সত্য, কিন্তু জয়গুন কি কেবলই ফকিরের উপর নির্ভরশীল ছিল? তা তো নয়। নয় বলে ফকিরের লোভের হাতকে ফিরিয়ে দেবার স্পর্ধা সে দেখিয়েছে। কেবল তা-ই নয়, মনোজাগতিক সব ভীতিকে জয় করে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'তাবিজ' ছাড়াই সূর্য-দীঘল বাড়ির মতো ভীতিকর বাড়িতে বাস করার। আবাল্য-লালিত কুসংস্কার থেকে জয়গুনের মুক্তিকে বৃহত্তর অর্থে লেখক সকল নিঃস্ব মানুষের মনোজাগতিক সংস্কারমুক্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ঔপন্যাসিকের আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে জয়গুনের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তিগত জীবনে ঔপন্যাসিক এ সব কুসংস্কারকে তার জীবনে স্থান দেন নি বরং তাঁর সব সময়ের চেষ্টা ছিল এর পেছনের হিংস্র স্বার্থান্ধ কার্য-কলাপকে খুঁজে বের করার, তাঁর স্মৃতি-কথা 'স্মৃতিবিচিত্রা'য় বর্ণিত বেশ কিছু ঘটনায় এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়।

মানবিকতাবোধে উজ্জীবিত আবু ইসহাক *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের চুম্বক-চরিত্র জয়গুনের মাঝে দুর্লভ মানবীয় গুণের সমাবেশও ঘটিয়েছেন। নিম্নবর্গের প্রতিনিধি জয়গুনের মাঝে কখনই নিম্নবর্গীয় সংকীর্ণতা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতার মতো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস, দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী সংগ্রামী জীবনের রুক্ষতা জয়গুনের কাছ থেকে তার মানবীয় প্রবৃত্তিগুলো কেড়ে নিতে পারে নি, আর পারে নি বলেই ঈদের দিন সামান্য মিষ্টান্ন তৃপ্তি মিটিয়ে না খেয়ে শফির জন্য তুলে রেখেছে, অত্যন্ত দ্রুত পথ-চলার তাগিদে অন্যের ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে নৌকা চালাতে নিষেধ করেছে, যদিও ক্ষেতটা তার নয়, ওই ধানে তার সামান্য অধিকার নেই। এ প্রসঙ্গে তার উক্তি স্মর্তব্য—

আমাগ খেত নাই বুইল্যা তুই অমন ফুলে ভরা ধানের উপর দিয়া কোষা চালাবি? যা খাইয়া মানুষ বাঁচে, হেইয়া লইয়া খেলা! খেতের আইল দিয়া যা।[৩৬]

ক্ষেতের আল দিয়ে যেতে দেরি হবে শুনে তার নির্বিকার প্রত্যুত্তর 'অউক দেরী।' অথচ সময়ের মূল্য যে তার কাছে নেই তা নয় বরং সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই তার দিন চলা, তবুও মানুষের ক্ষতি তার কাম্য নয়। জয়গুন তাই জীবনযাপনের সব মলিনতাকে অতিক্রম করে মানবতার মহিমায় উদ্ভাসিত।

প্রখর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জয়গুন নিরন্তর জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছে সর্বগ্রাহ্য এক দৃঢ় ব্যক্তিত্ব। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে নিয়তিবাদী বটে, যেমন— মায়মুনের বিয়ের প্রসঙ্গে তার মত — "নছিবে যদি ঐখানে ভাত লেইখ্যা থাকে, তয় অইব। কার কোনখানে দানা-পানি লেহা আছে, খোদা জানে।"[৩৭] আবার ঘরের চালে ছন না থাকায় ঝড়-বৃষ্টিতে ভেজা-প্রসঙ্গে সে নির্বিকার—

কপালে আছে ভিজতে অইব, ভিজমুই।[৩৮]

তবে যখন কোন সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে নিয়তিবাদী হয়ে আর থাকেনি। দৃঢ় কণ্ঠে নিজের বিবেচনাপ্রসূত মত প্রকাশ করেছে। দুইবার বিয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে ঘর বিমুখ করেছে — সেটাই একমাত্র সত্য নয়। করিম বক্‌শকে পুনরায় বিবাহে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রবল আত্মসম্মান, সে দৃঢ়ভাবে এ বিয়েতে তার অমত জানিয়ে উচ্চারণ করেছে—

যেই থুক একবার মাডিতে ফালাইছি, তা মোখ দিয়া চাটতে পারতাম না।[৩৯]

অথচ মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থ করিম বক্‌শকে পুনরায় বিবাহ করলে নিরন্নতা ঘুচত; তার সন্তানেরাও পিতৃগৃহে দু'বেলা খেয়ে বাঁচতে পারত। করিম বক্‌শের কাছ থেকে প্রাপ্ত দৈহিক নির্যাতন ও 'বিনাদোষে তালাক' জয়গুনকে হয়ত বিমুখ করেছে তার প্রতি, কিন্তু প্রবল মাতৃত্বের অধিকারী জয়গুন তার সন্তানদের মুখ চেয়েও কি ফিরে যেতে পারে নি পূর্বতন স্বামীর গৃহে? কেবল ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিরূপতার কারণ তার সন্তানস্নেহের চেয়েও কি বড়ো হয়ে উঠেছে? সংগত কারণেই এসব প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাতে হয় তাকে এবং মাতৃত্বের Archetype বলে বিবেচিত জয়গুনের এই কার্যের পেছনে ব্যক্তিগত বিরূপতা তার ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় করলেও অজুহাত হিসেবে অত্যন্ত নাজুক বিবেচিত হয়। গভীর অনুসন্ধানে ভিন্ন তাৎপর্যেরও সন্ধান মেলে। শরিয়ত মতে পূর্ব স্বামীকে পুনরায় বিয়ে করতে হলে প্রথমে অন্য একজনকে বিয়ে করে তালাকপ্রাপ্ত হতে হয়। করিম বক্‌শের তাতে আপত্তি ছিল না। সে শরিয়ত মেনেই পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করতে চেয়েছে; কিন্তু জয়গুনের আপত্তি স্পষ্ট—

– শরিয়ত মত আগে একজনের লগে সাঙ্গা বইয়া হেইখান তন তালাক লইয়া তারপর? ওহোঁ। .....
– শরিয়তে থাকলেও আমি পারতাম না।[৪০]

দীর্ঘদিনের সংগ্রামশীলতায় রূপান্তরিত,আত্মনির্ভর,আত্মসচেতন জয়গুনের পক্ষে ব্যক্তিত্বের অবমাননা সম্ভব নয়, সে আর এখন পুতুল-বউ নয় যাকে যেমন-খুশি তেমন করে খেলা

যাবে, এখন সে একজন পরিপূর্ণ মানুষ, একজন ব্যক্তি। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তাই করিম বক্‌শের গৃহে তার ফেরা হয় নি। জয়গুনের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক যে শ্রেণির মানুষকে রূপায়িত করেছেন আপাতদৃষ্টিতে তারা জীবন-যুদ্ধে পরাজিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা পরাজিত হয়েও থেমে যায় না , হেরে যায় না, নতুন করে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় — সেখানেই তাদের জয়, আবু ইসহাকের জীবনদর্শন জয়গুনের মধ্য দিয়ে সেই জয়কে সূচিত করেছে।

প্রখর জীবনবোধ, সুনির্দিষ্ট কাল পরিধি, বাস্তব জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতার সম্মিলিত শিল্পরূপ আবু ইসহাকের *সূর্য-দীঘল বাড়ী*। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর পরই এ উপন্যাস বহু প্রশংসা ও বিরূপ সমালোচনা দুইই লাভ করেছে। এ উপন্যাসে লেখক মূলত গ্রাম-বাংলার প্রান্তিক মানুষের জীবন দেশ-কাল-সমাজের প্রেক্ষাপটে সরলভাবে উন্মোচিত করেছেন। বর্ণনাধর্মী এবং বহির্বাস্তবতা প্রধান হওয়ায় এ উপন্যাসকে অনেকেই 'স্কেচধর্মী রচনা'[৪১] বলে অভিহিত করেছেন বটে, কিন্তু উপন্যাস-সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনায় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিকতা পাওয়া যায় নিঃসন্দেহে।

চিত্রশিল্পের Term 'স্কেচ' শব্দটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন ব্যবহৃত হয় — তখন তা ভিন্ন তাৎপর্য লাভ করে। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে 'সামাজিক নকশা'কে 'স্কেচ' বলে তাৎপর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* নিঃসন্দেহে 'কলিকাতা কমলালয়' কিংবা 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মতো সামাজিক নকশা নয়। চিত্রশিল্পে 'স্কেচ' অভিধায়, রূপকে প্রান্ত রেখার নির্ভরতায় পরিস্ফুট করা হয়। তাতে অভিব্যক্তির বিশদ বৃত্তান্ত থাকে না। তা যখন রেখা ও রঙের প্রয়োগে বিস্তৃত ভাষ্য পায় তখন তাকে আর স্কেচধর্মী বলা যায় না। বর্তমানে সাহিত্যে 'স্কেচধর্মী' রচনা বলতে সে রচনাকে বোঝায় যাতে কোন বহিঃকাঠামোকে রূপায়িত করা হয় মোটা দাগে এবং তাতে জীবনের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ, উপাদান থাকে না। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে যে জীবনকে ধারণ করা হয়েছে সে-জীবনের অনুপুঙ্খ, বিস্তৃত বিবরণ আছে — সেক্ষেত্রে স্কেচধর্মী রচনা বলে আমরা এ উপন্যাসকে বিবেচনা যথার্থ মনে করতে পারি না। মোক্ষম সংলাপ, বর্ণনার সুমিতায়ন আর বক্তব্যপুষ্ট সংক্ষিপ্ত ভাষার উপকথা, প্রবাদ-প্রবচনের যে আবহ তৈরি হয়েছে এ সাহিত্যকর্মে এবং শাশ্বত বাংলার স্নেহার্দ্র মাতৃহৃদয়, নারীকুলের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভাই-বোনের বন্ধন এবং এর সঙ্গে কলোনিকালের ঘটনার সংঘাত সব মিলিয়ে উপন্যাসটি অবশ্যই উপন্যাস-সুলভ ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

উপন্যাস-বিচারে ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনের রূপায়ণ গুরুত্বসহকারে মূল্যায়িত হয়। বলা হয়ে থাকে যে, স্রষ্টার জীবনসংক্রান্ত গুরুত্ববোধ ও অভিজ্ঞতার মানসিক রূপই অখণ্ড উপন্যাসের মধ্যে প্রবাহিত হয়।[৪২] আবার, এও ঠিক যে, উপন্যাস কেবল জীবন-চিত্র নয়, আকাঁড়া বাস্তবতা নয়, ইতিহাস নয় — জীবন বা বাস্তবতার শিল্পসম্মত রূপায়ণ।[৪৩]

> Books are not life. They are only tremulationsons on the ether. But the novel as a tremulation can make the whole man alive tremble. Which is more than poetry, philosophy, science or any other book-tremulation can do.[৪৪]

ঔপন্যাসিক ব্যক্তিজীবনের বহুমাত্রিক সমস্যাকে সমাজ সভ্যতা ও রাষ্ট্রের পটভূমিতে বিন্যস্ত করে এককের মধ্যে বহুত্বকে প্রত্যক্ষ করেন। প্রতিকূল পরিবেশে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে জয়গুনের যে জীবন-সংগ্রাম তা তার ব্যক্তি-জীবনকে কেবল নয়,স্বশ্রেণির স্ব-সমাজের স্বরূপকেও উদ্ঘাটন করেছে। জয়গুনের জীবন লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই ফল। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন — ১৯৪৪ সালে তিনি সিভিল সাপ্লাইয়ের চাকুরি নিয়ে কলকাতা থেকে নারায়ণগঞ্জ যান। চাকুরিগত কারণে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা যাবার সময় ট্রেনে জয়গুনদের মতো বহু সংগ্রামী নারীকে তিনি দেখতেন — যারা জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য সামাজিক বন্ধন অগ্রাহ্য করে ময়মনসিংহ থেকে সস্তায় চাল কিনে এনে গ্রামে গ্রামে সামান্য লাভে বিক্রি করত। 'ফতুল্লা' ও 'চাষাড়া' স্টেশনে ট্রেন পৌঁছাবার আগে চালের থলিগুলো তারা রেলরাস্তার পাশে ফেলে দিত।[৪৫] এছাড়া ছিন্নমূল মানুষের ভিড়ে নারায়ণগঞ্জের স্টিমারঘাটে এবং রেলস্টেশনে হাসুর মতো অনেক নম্বরবিহীন কিশোর মুটেকে দেখেছেন। গ্রাম-বাংলার ওঝা-ফকির, তাদের চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং গ্রামীণ মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা ও জীবন-প্রণালীও লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ। এছাড়াও লেখকের ব্যক্তিগত কথন থেকে জানা যায় যে, তাঁর মামাবাড়ির পাশে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' নামে একটি ছাড়া-ভিটে ছিল। তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে শুনেছেন যে, সে বাড়িতে মানুষ স্থায়ীভাবে বাস করতে পারে নি; যারা চেষ্টা করেছে তাদের বংশের বিনাশ ঘটেছে।

লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ প্রভৃতি ঘটনায় আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামোর পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম-বাংলার নিরন্ন মানুষের সংগ্রামী প্রয়াস শিল্পরূপ লাভ করেছে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে। এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নিখুঁতভাবে দেশ-কাল-সমাজকে পর্যবেক্ষণ করে সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি বিরোধী এবং উদার কুসংস্কার-মুক্ত জীবন-সত্তাকে স্থাপন করেছেন চিরায়ত গ্রামীণ সমাজে। একজন সমালোচক খেদ প্রকাশ করে লিখেছেন—

> এই নদী, এই বৃষ্টি, এই বাতাস, এই পাহাড়, এই সমতল আর এই সমুদ্রকে অন্বিত করে যে-মানুষ সে তার নিজের বাঁচার কাহিনী নিয়ে আমাদের উপন্যাসে এল না ।[৪৬]

এ উপন্যাসে তো মানুষ তার বাঁচার কাহিনী নিয়েই এল; মানুষের জীবনে কত প্রতিবন্ধকতা এল, তাকে বিনাশ করতে চাইল, তাকে ভেঙে ফেলতে চাইল কিন্তু মানুষ তো তার জীবনের কাছে নতি স্বীকার করল না; সর্বস্ব হারিয়েও নতুন আশায় নতুন করে বাঁচার প্রেরণায় নতুন পথে যাত্রা শুরু করল।

নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ গড়ার পটভূমিতে রচিত *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে আপাতদৃষ্টিতে এই ভাঙা-গড়ার বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু জয়গুনের জীবন-প্রবাহ উপন্যাসের সমাপ্তিতে যে একটি নতুন ইঙ্গিত দিয়েছে পরবর্তী সম্ভাবনার — ইতিবাচক বা নেতিবাচক যা-ই হোক না কেন — সেখানে সমাজের চলিষ্ণু চেহারা উঠে এসেছে। একটি সীমাবদ্ধ সময়ের পরিধিতে রচিত হলেও *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাস চিরায়ত বাংলার নিম্নবর্গীয় মানুষের বেদনা ও বিক্ষোভ, সংকট ও সংকল্পের তাৎপর্যপূর্ণ দলিল।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. দেবেশ রায়, *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে* (কলকাতা : প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯৯৪), পৃ. ১১
২. দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত পরে রচিত তুষার কান্তি ঘোষের প্রতিবেদনমুখী বর্ণনা, The Bengal Tragedy, (Lahore: Hero Publication, 1944), পৃ. ৩৯
৩. আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (ঢাকা : নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, অষ্টাদশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬), পৃ. ৯। এখন থেকে উদ্ধৃতির জন্য গ্রন্থের উক্ত সংস্করণ দ্রষ্টব্য
৪. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১
৫. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০-৩১
৬. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৬-৯৭
৭. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯-৭০
৮. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭
৯. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭
১০. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৮
১১. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৮-৮৯
১২. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫
১৩. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫
১৪. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭
১৫. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৯
১৬. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০
১৭. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩
১৮. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪
১৯. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, *টোটেম এ্যান্ড ট্যাবু*, অনুবাদ : জেম্স্ স্ট্যাচি (লন্ডন : রাটলেজ এ্যান্ড কেগান পল, ১৯৫০), পৃ. ২৪
২০. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০
২১. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০
২২. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২
২৩. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথা সাহিত্য* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, অক্টোবর ১৯৯৭), পৃ. ১০৩
২৪. হাসান আজিজুল হক, *কথাসাহিত্যের কথকতা* (সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪), পৃ. ১৮
২৫. মহীবুল আজিজ, *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০২), পৃ. ১৫৮
২৬. মহীবুল আজিজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৭
২৭. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০
২৮. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫
২৯. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩
৩০. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯
৩১. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০
৩২. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮
৩৩. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮
৩৪. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮
৩৫. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০০

৩৬. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬*
৩৭. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪*
৩৮. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪*
৩৯. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫*
৪০. *সূর্য-দীঘল বাড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২-৯৩*
৪১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ. ১১
৪২. সৈয়দ আকরম হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯
৪৩. সৈয়দ আকরম হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯
৪৪. D.H. Lawrence, *The one bright book of life; Selected literary Criticism* (London, 1961), P.105
৪৫. নাসির আলী মামুনকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী, 'প্রথম আলো', ১৬ নভেম্বর ২০০১
৪৬. দেবেশ রায়, *উপন্যাস নিয়ে* (কলকাতা : দে,জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯১), পৃ. ৪২